প্রতিবাদী সংস্কৃতি উদ্বাস্তু হচ্ছে কেন ?

দিলীপ বাগচী

চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর জ্যোতি বসু সম্প্রতি এক সভায় প্রসঙ্গতঃ বলেছেন যে তিনি নাকি সংস্কৃতিটা ভালো বোঝেন না । এটা অবশ্য তাঁর বলার অপেক্ষা রাখে না । 'হোপ ছিয়াশি'র আসরে তারকা-শ্যালিকা পরিবৃত হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত 'নাচা-গানা' শোনার মধ্যেই তাঁর সংস্কৃতির পরিচয় তিনি রেখেছিলেন । ঐ দলের অনেকের অবস্থাই জ্যোতিবাবুর মতো কেন, তাঁর চেয়েও আরো খারাপ ।

কিন্তু, আমরা যারা প্রগতিশীল বা বিপ্লবী বা প্রতিবাদী গণ সংস্কৃতির চর্চা করি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, সেই আমরাও কি সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করি ? আমার তো মনে হয় না । বেশিরভাগ গণসাংস্কৃতিক কর্মীর ধারণা এই যে, 'সংস্কৃতি' মানে গান, নাটক (চলচ্চিত্র সহ) এবং আবৃত্তি। আর একটু বেশি চিন্তাশীল কর্মীরা সাহিত্য, চারু ও কারু শিল্পের সব শাখা পর্যন্ত এর পরিধিকে বিস্তার করেন । প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি আরো ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত একটা ব্যাপার, যা জীবনচর্যার প্রায় প্রতিটি নড়ন চড়নের সাথে যুক্ত । আসলে গান-নাটক-অন্যান্য শিল্পকলা-সাহিত্য, - এসবই হচ্ছে সংস্কৃতির বহিরঙ্গ যা একটা বিশেষ মানসিকতা তথা জীবনদর্শনের প্রতীক রূপ মাত্র । এই মানসিকতার একটা অংশ পরিবার ও জনগোষ্ঠীগত পরিবেশ থেকে আসে ঐতিহ্যবাহী হিসাবে, আর অপর অংশটি ব্যক্তিমানুষটি তার নিজের প্রবৃত্তিজাত রুচি থেকে তৈরি করে । এই প্রবৃত্তিটার গঠনের ব্যাপারেও পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

একটা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব রুচি ও সংস্কৃতির প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়ে তার পোষাক পরিচ্ছদে ; এছাড়াও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে, খাদ্যাভ্যাসে, গৃহ-আসবাব-তৈজসপত্রের চেহারাতে এবং আরো খুঁটিনাটি বহু দিকে । কাজেই সংস্কৃতির একটা সামগ্রিকতা আছে, যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতেই পারে এবং হয়ও । গান-নাটক ইত্যাদি সেই সমগ্র সংস্কৃতির খন্ডিত রূপ মাত্র ।

আমরা খুবই সচেতনভাবে কোনও গণসঙ্গীত গেয়ে ও গণনাটক মঞ্চস্থ/মাঠস্থ/পথস্থ করে 'একটা কিছু ভাল করা গেল' মনে করে শ্লাঘা অনুভব করি । কাজগুলি নিঃসন্দেহে ভাল কাজ । কিন্তু আমাদের বেশভূষায়, আচার-

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আচরণে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে কতটা ঐ গান/নাটকের পরিবেশনের সময় ব্যবহার করি ? যদি বর্জন করি তবে তার পেছনে যুক্তি কি ? যুক্তি থাকলে সেটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ? এসব প্রশ্ন আমাদের মনে খুবই কম জাগে ।

ভারতীয় জনজীবনে সংস্কৃতি ধর্মের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে । সংস্কৃতি রয়েছে তার লোকাচারে । ধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় জনজীবনের ধারণা পাশ্চাত্যের Religion-এর ধারণার সমার্থক নয় । Religion বলতে বুঝায় ঈশ্বরের প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাস ও আনুগত্য । এই আনুগত্য যাজকতন্ত্রের কঠোর অনুশাসনে বাঁধা - সেখানে লোকাচার-লোকধর্মের অনুপ্রবেশের বা মিশ্রণের সুযোগ প্রায় বন্ধ । কিন্তু ভারতীয় জনজীবনে সাধারণ মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করে যে ধর্ম তা অনেক নমনীয়, সহিষ্ণু ও আত্তীকরনে সক্ষম। এখানে সনাতন ধর্মের সাথে লোকধর্ম ও লোকাচারের মিশ্রণ সহজেই অবাধে ঘটেছে ও ঘটছে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিরোধ সত্ত্বেও । অথচ আমরা দেশের সংস্কৃতির মননগত ভিত্তি তথা আধারকে এক কথায় নাকচ করে দিলাম 'সামন্ততন্ত্র এবং কুসংস্কার' আখ্যা দিয়ে । আবার আমাদের বিপ্লবী ধারণাজাত নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন আধার তথা জনমানসে নতুন মননগত ভিত্তি তৈরি করতে ব্যর্থ হলাম - বা, বলা ভাল, তৈরি করার চেষ্টা করলাম না । ফলে আমাদের নয়া সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের গন্ডির বাইরে খুব বেশি এগোতে পারল না - পারছে না । ব্যাপক জনগণ এটাকে অনেকটা কালাপাহাড়ি সংস্কৃতি বলে ভাবছেন । যেহেতু পুরানো মূল্যবোধ চূর্ণ করে শূন্যস্থানে নতুন মূল্যবোধ, অর্থাৎ পাল্টা বিপ্লবী মূল্যবোধ দিতে পারা যাচ্ছে না । এদিকে বিপরীতক্রমে আমরা প্রকারান্তরে মূর্তিপূজা, তিথিপালন ও মন্ত্রপাঠ করছি এবং পাশ্চাত্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিকতার কলমের চারা আমাদের জীবনের জমিতে লাগিয়ে দিয়েছি । ফলে জনমানসে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে । ওঁরা ভাবছেন, আমরা নিজেদের ধর্ম ছেড়ে অন্য এক ধর্ম নিতে বলছি । ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বলা যাক ।

কর্মহীন ঈশ্বরভক্তি বা মূর্তিপূজা বা প্রার্থনা কোনও ফল দেয় না । আমরা দেব-দেবী-মন্ত্রে বিশ্বাসী নই । কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও-স্তালিন ইত্যাদি নেতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি বা ছবি ঘরে রাখি । বিশেষ তিথিতে দেবদেবী তথা নানা মতের নানা ঈশ্বরের আরাধনা হয় । আমরাও ঐসব নেতাদের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন বা মে দিবস বা নভেম্বর দিবস ইত্যাদি নানা দিবস ক্ষমতা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

অনুযায়ী আড়ম্বরের সাথে পালন করি । এঁদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রের বিকল্প শ্লোগান ও তাত্ত্বিক কথাবার্তা বলে ঐসব ব্যক্তিত্বের বা দিবসের তাৎপর্য ও প্রশংসা কীর্তন করি । দেবার্চনার মন্ত্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট দেবতার রূপ গুণ ও ক্ষমতা ইত্যাদি প্রশংসিত হয় । তবু, যতক্ষণ গণসংগ্রাম, গণ আন্দোলনে, মুক্তিসংগ্রাম বা জাতি পুনর্গঠনের সংগ্রাম চলে ততক্ষণ ঐ সব দিবস-পালন আমাদের সংগ্রামে প্রেরণা দেয় । সংগ্রামের বা তার প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে ঐ সব দিবস-পালন রিচুয়ালের চেয়ে মহত্তর কিছু নয় । এই সব অভ্যাস থেকে যুক্তির বদলে অন্ধ বিশ্বাস এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক মৌলবাদ জন্ম নেয় । অর্থাৎ আমরা এক ধরনের ঈশ্বর ও মন্ত্র-বিশ্বাসকে সামন্ততান্ত্রিক ও কুসংস্কার বলে পরিত্যাগ করে আরেক ধরনের ঈশ্বর সৃষ্টি করে নতুন মন্ত্র ও নতুন রিচুয়ালের মধ্যে নিজেদের টেনে নামাচ্ছি, নতুন ধরনের মৌলবাদের জন্ম দিচ্ছি । জনগণ এমনটাই ভাবেন, তবে আমার ভাষায় নয়, তাঁদের মত করে ।

সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় (কু)সংস্কার বলে মৃতের জন্য শোক ও শ্রদ্ধা দেখাতে শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও নির্দিষ্ট কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোক পালনের দেশীয় রীতি আমরা বর্জন করেছি । পরিবর্তে কালো ব্যাজ (কালো পোশাকের মিনি রূপ) পরিধান, পতাকা অর্ধনমিত করা, দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, নির্দিষ্ট কয়েকদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বা দলীয় শোক পালন করছি - এবং এগুলি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে এসেছে খ্রিষ্টধর্মের নানা সময়ের নানা রিচুয়াল থেকে । জন্মদিনে পায়সের বদলে কেক খাওয়া (কাটা), প্রদীপ জ্বেলে শঙ্খ বাজিয়ে বরণের পরিবর্তে মোমবাতি নেভানো - এসবই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টধর্ম থেকে গৃহীত । আপ্যায়নের জন্য গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে 'স্বাস্থ্য পান'-এর উৎসও তাই-ই । নব পরিচয় ঘটলে নমস্কার না করে 'হাই' বলি (জনৈক বন্ধু বলেন 'হাই তোলে'), করমর্দন করি । নিজেদের সামাজিক বিশিষ্টতাকে নাকচ করে, পাশ্চাত্যের কৃষ্টির প্যারডি রচনার মধ্যে কি ধরণের প্রগতিশীলতা আছে, এবং থাকলে কেন তা আছে - এসব আমরা সাংস্কৃতিক কর্মীরা কি কখনো ভেবে দেখেছি ? পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায় ।

প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে জানবার চেষ্টা না করে, এক কথায় 'সামন্ততান্ত্রিক ধর্মাশ্রয়ী' আখ্যা দিয়ে তাকে বর্জন করে, অন্য ধর্মের অন্য সংস্কৃতির বহিরঙ্গকে তার বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছি । উচিত ছিল, পাল্টা সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ (দার্শনিক / তাত্ত্বিক ভিত্তি) ও বহিরঙ্গ সৃষ্টি

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ও প্রতিষ্ঠা করা, যদি নিতান্তই আমাদের ঐতিহ্যবাহিত সংস্কৃতিকে সমূলে বর্জন করা দরকার হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি মহলের গন্ডির বাইরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিষ্টধর্ম বা অন্যধর্ম গ্রহণ করাটা প্রগতি নয়! এ যেন অনেকটা ধূমপান ছাড়তে জর্দা ধরা!

আমাদের এমন একটা মোটা দাগের ধারণা আছে যে ধ্রুপদী শিল্পকলা মাত্রই যেহেতু সূক্ষ্ম ও মহার্ঘ, সুতরাং তা সামন্ততান্ত্রিক, অতএব বর্জনীয়। এটা একটা মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা। এটা ঘটনা যে, বহু শিল্পকলাই ধ্রুপদী রূপ পেয়েছে সামন্ততন্ত্রের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে তার মনোরঞ্জনের জন্য; কিন্তু সেই শিল্পের স্রষ্টারা সামন্ত প্রভু ছিলেন না। সে সব শিল্পের সৃষ্টির মূলেও ছিল শ্রম ও বেদনা। আমাদের ভোজ্য তালিকার বহু উপাদেয় ও মহার্ঘ পদই তো সে ভাবে ভাবলে সামন্ততন্ত্রের অবদান, তা বলে আমরা সেগুলো বর্জন করব কি? কিছুকাল আগে দামের নিরিখে আলুও প্রায় বুর্জুয়া খাবার হয়ে উঠেছিল!

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা কি তবে পাশ্চাত্য যা কিছু বর্জন করে আমাদের ঐতিহ্যবাহী রিচুয়ালগুলিতে ফিরে যাব? অবশ্যই তা নয়। আমাদের ঐতিহ্যবাহিত সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ না করে, অন্য সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলিকে আত্তীকরণের মাধ্যমে সমন্বিত করতে হবে। রিচুয়ালগুলি বেশিরভাগই মানুষের কল্যাণ কামনায় সৃষ্টি। সেগুলির অন্ধ বিশ্বাসের দিকটা বর্জন করে তার কল্যাণের দিক, তার নান্দনিক দিক গ্রহণে আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়। ঐ আধারে আমরা নতুন দিনের কথা, সংগ্রামের কথা, মানুষের কাছে নিয়ে গেলে, আমার ধারণা, তা অনেক বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। জিনসের ওপর তীরবিদ্ধ হরতনের ছাপওয়ালা ঢোল রঙিন গেঞ্জি পরে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিয়ে, গলায় দোতারার এক পরিশীলিত সংস্করণ ঝুলিয়ে যিনি লোকসংগীত বা গণসংগীত গাইছেন, তিনি মঞ্চে দর্শনদানমাত্র ঐ সব সংগীতের ট্রাডিশনাল শ্রোতাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন। তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে যদি ববছাঁট চুলওয়ালী, ম্যাক্সি বা নাইটি পরিহিতা, আঁচলের বিকল্প স্কার্ফ গলায় কোন অত্যাধুনিকা (?) বধূকে দেখা যায়, তবে দৃশ্যটা কেমন হবে? এই বহিরঙ্গে তথাকথিত বিদ্রোহী সংস্কৃতিকে আমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারি না। এর মধ্যে আছে অবচেতনে থাকা শতাব্দী লালিত হীনমন্যতাজাত সচেতন পাশ্চাত্য-অনুকরণের নির্বোধ প্রবৃত্তি। একারণেই গণসংস্কৃতি বাণিজ্যিক সংস্কৃতির প্রতিবাদী পাল্টা সংস্কৃতি না হয়ে অন্যতম বাণিজ্যিক সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেদনা বোধ হয়, যখন দেখি একশ্রেণীর

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

উচ্ছৃঙ্খল তরুণ 'থাকিলে ডোবা খানা' গানের সাথে নিতম্ব দুলিয়ে বিকৃত রুচির সেই জাতীয় নাচ নাচছে, যে নাচ যৌন আবেদন জাগানো পাশ্চাত্য সুরারোপিত কোনো দেশীয় ফিল্মি গানের সাথেও তারা নাচে। গানটির প্রসঙ্গ এসে গেল বলেই বলছি, ক্যাসেটকৃত এই গানটিতে রচয়িতা গুরুদাস পালের স্বীকৃতি তো নেইই, উপরন্তু মূল গণসংগীতটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি সযত্নে বাদ দিয়ে গানটির প্রাসঙ্গিকতা তথা গণচরিত্রকে নষ্ট করে 'লোকসঙ্গীত' বলে চালানো হয়েছে। আর এর গায়নভঙ্গী কেমন হয়েছে, তা আগে বলা নাচের বর্ণনাতেই মালুম হবে। গণসঙ্গীতের কপিরাইট রচয়িতারা রাখেন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাই বলে এই বেলেল্লাপনা সইতে হবে ? এই সব ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে না ? গণসঙ্গীত কারো পছন্দ না হতেই পারে, তাই বলে তাকে বিকৃত বিকলাঙ্গ করার অধিকার কারো নেই।

এই নিবন্ধ এই বলেই শেষ করব যে, কেন যেন মনে হচ্ছে গণসংস্কৃতি উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছে। এর জন্য আমরা গণসংস্কৃতির প্রচারকরা দায়ী। আমরা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বাস্তুকে পরিত্যাগ করেছি। পরিবর্তে অক্ষম নির্বোধ পরানুকরণকে প্রগতিশীল বলে ভেবেছি ও ভাবছি। আমরা প্রতিবাদী পাল্টা সংস্কৃতি গড়তে গিয়ে বুর্জুয়া সংস্কৃতির বিকল্প সৃষ্টি করেছি। কে না জানে যে, বিকল্প মানে বিপরীত বা বিরোধী নয় ? এর পাশাপাশি বুর্জুয়াদের দেওয়া সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট গলায় ঝোলানো, স্বঘোষিত মেকি বামপন্থী সরকারী দলগুলি গণসংস্কৃতিকে বুর্জুয়া সংস্কৃতির পরিপূরক করে তুলেছে নিজেদের গদি রক্ষার স্বার্থে। বিপ্লবী গণসংস্কৃতি তার স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি গড়তে পারছে না, বাজারি বুর্জুয়া সংস্কৃতি বা বাজারি গণসংস্কৃতি থেকে আলাদা করে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের নগ্ন চেহারার পাশাপাশি এদেশে বিপ্লবী মতাদর্শ যাঁরা ভাবেন বা প্রচার করেন, মেকি বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁদের বিচিত্র দোলাচলচিত্ততাও স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। একই গান বা নাটক ওরাও শোনাচ্ছে, আমরাও শোনাচ্ছি। তবে সাচ্চা কে ? এটাই আইডেন্টিটি সমস্যা। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের হাতে তত্ত্ব আছে। আমাদের জনগণের আছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক আধারের উত্তরাধিকার। এই দু'য়ের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি হবে বিপ্লবী ভারতীয় সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির স্পেয়ার পার্টস এনে ভারতে ভারতীয় কারিগর দিয়ে সংযোজিত সংস্কৃতি নয়। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটা ভাল অংশ

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

খুব জিজ্ঞাসু, পরিশ্রমী, সৎ ও নিবেদিত। তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর আস্থা আছে। তাঁরা ভারতীয় মানসিক গঠনের আধারে স্থাপনের উপযুক্ত প্রতিবাদী সংস্কৃতি নিশ্চয়ই সৃষ্টি করতে পারবেন। আমরা যেটা পারিনি সেটা নব প্রজন্ম করুন। আমরা আছি, আমরা থাকব -- প্রতিবাদী সংস্কৃতি তার বাস্তু ফিরে পাবেই।

['সাংস্কৃতিক সমসময়' পত্রিকার (অক্টোবর, ১৯৯৯-তে প্রকাশিত ও এপ্রিল, ২০০৭-এ পুনর্মুদ্রিত) সৌজন্যে।]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।